চুপি চুপি বাঁশি বাজে

রাহাত খান

(গল্প)

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ০৮, ২০১১

শনিবার। বাইরে পড়ন্ত দুপুর। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর, আলস্য ও আরাম—এই দুই প্রিয় সঙ্গীকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল আয়াজ। ঠিক ঘুম নয়, ঘুম আর তন্দ্রার মাঝামাঝিতে ছিল। তন্দ্রার ভাগ খানিকটা বেশি।

সময়টা বৈশাখের শেষ দিক। বাইরে রোদ-বাতাস দুই-ই গলাগলি করে ছিল। জানালা গলিয়ে বাতাসের একেকটা মৃদু বা মাঝারি ঝাপটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা আয়াজের এলিয়ে থাকা শরীরে এসে লাগছিল। সে তো ঠিক ঘুমের মধ্যে নয়। বেশ লাগছিল তার শুয়ে থাকতে আর মাঝেমধ্যে বাতাসের ঝাপটা খেতে। এই না হলে উইকএন্ড!

আয়াজ ছুটির দুপুরে ঘুম-তন্দ্রার জারক মেশানো সময়টার নাম দিয়েছে হোয়াট এ প্লেজার। সবে চল্লিশে পা দেওয়া তার স্ত্রী মিলি এই সময়টার নাম দিয়েছে ইংরেজিতে মোর দ্যান লাভ। মিলি

ঠাট্টা, কৌতুক যা-ই করুক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সিরিয়াস, কোথাও বেরোতে না হলে দুপুরের একটু পর আয়াজ কোলবালিশটা পাশে নিয়ে বিছানা নেবেই। বহুদিনের অভ্যাস।

বিকেল এখন অনেকটা রোদ খেয়ে নিয়ে দুপুরকে আলবিদা জানানোর তালে আছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অনেকক্ষণ সাজগোজ করা চলছিল মিলির। বিকেলে হাই-টির দাওয়াত পাশের অ্যাপার্টমেন্টের জামশেদ সাহেবের বাসায় ছেলের পড়াশোনা করতে বিলেত যাওয়া উপলক্ষে। পুরো পরিবারেরই দাওয়াত।

মিলি শাড়ি, অলংকার পরেটরে একদম তৈরি। বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে থাকা স্বামীর উদ্দেশে সে বলে, জিন্দা না মওতা?

চোখ না খুলে ঘুমজড়ানো গলায় আয়াজ বলে, মওতাই বলতে পার। সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট...

মিলি বলে, ঢং কোরো না, যাবে কি না বলো...

তেমনই ঘুমজড়ানো গলায় আয়াজের উত্তর, কী করে যাই। শরীরে ঘুমের হাই ফিভার। এক শ আট ডিগ্রির কম নয়।

মিলি বলে, ঠিক আছে, তুমি থাকো তাহলে। জামশেদ সাহেবরা মুক্তাগাছা থেকে অরিজিন্যাল মণ্ডা, কুমিল্লা থেকে রসমালাই এনেছে বলে শুনেছি। যাই, আমরাই গিয়ে মিষ্টির বংশ ধ্বংস করে আসি!

এ কথা শুনে চোখ খুলে মিলির দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে আয়াজ বলে, খুব ভালো। খুব ভালো। আর ছটাক দুই মেদ-চর্বি না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তো ঠিক মুটকি বলা যাচ্ছে না। মিষ্টি মাংস, ঘি, চর্বি খেয়ে এটুকু জোগাড় করে ফেলো! যত তাড়াতাড়ি পারো...

মিলির এমনিতেই একটু মোটাঘেঁষে শরীর। আয়াজের কথা শুনে যেন খুব দুঃখ পেয়েছে, সে বলে, আমি মুটকি! বেশ, মুটকিই ভালো! আমি আর কদিন। বড়জোর দুই বছর, আড়াই বছর। তারপর তো একদমই সবাইকে গুডবাই জানিয়ে আল্লার কাছে চলে যাব!

তাহলে মন্দ হয় না। আয়াজের চোখ এখন খোলা। তাকে গম্ভীর মনে হচ্ছিল। বলে, তা ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তোমার বিকল্প একটা ব্যবস্থা যদি করে দিয়ে যাও, তো খুব ভালো হয়!

এরপর কথা নয়, অ্যাকশন। শুয়ে থাকা আয়াজের পিঠে চার-পাঁচটা গুমগুম কিল। আয়াজ তখন হাসছিল।

কাজের বুয়া বাইরে। বস্তিতে নিজেদের ঝুপড়িঘরে গেছে বাচ্চাকাচ্চা আর তার বাপকে দেখতে। সন্ধ্যার আগে ফেরার সম্ভাবনা খুব কম। স্নেহা ও প্রিয়কে নিয়ে মিলির বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানা থেকে উঠে গিয়ে তাকেই বন্ধ করতে হয় দরজাটা।

ফিরে এসে আয়াজ আবার বিছানায়। চটে যাওয়া ঘুম ও তন্দ্রার আবেগটা ফিরিয়ে আনতে চোখ বোজে। কিন্তু যা যায়, তা কি সহজে ফিরে আসে! তবু চোখ বুজে শুয়ে থাকে সে। ঘুম না আসুক, বিছানায় লাট হয়ে শুয়ে থাকার আরামটা ঠিকই পাচ্ছিল। যেন বা সে চাইছিল সপ্তাহজুড়ে একটু একটু করে জমতে থাকা একঘেয়েমিটুকু কাটিয়ে উঠতে।

তার চাকরি একটা বেশ নামকরা করপোরেট বিজনেস হাউসে। তার পজিশন টপ বসকে বাদ দিলে চারজনের নিচে। মাইনেটা ছয় ডিজিটে পৌঁছে আপাতত মাঝামাঝি থমকে আছে। তবে প্রমোশনের শর্ট লিস্টে তার নাম উঠে গেছে। এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আর অফিসে তার কাজকর্ম খুব যে একটা ঘাম ছোটানো, তা-ও না। গোটা অফিস বাঁধা আছে অলক্ষ্য এক ডিসিপ্লিনে। কাজকর্ম সবাইকে ঠিকই করতে হয়। তবে সেটা তার কাছে দুঃসহ বা কঠোর কঠিন

বলে মনে হয় না কখনো। বেশ আছে সে, তার বেশ নামকরা করপোরেট বিজনেস হাউসের চাকরিতে।

শুধু তো মোটামুটি হেভিওয়েট চাকরি নয়। ছোটবেলা থেকে লেখালেখির অভ্যাস ছিল, এখন বিস্তর লেখালেখি করে আয়াজ। গল্প, কবিতা বা উপন্যাসজাতীয় কিছু নয়, সে লেখে দেশের সবচেয়ে নামকরা দুটি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকে, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কলাম। গল্প-উপন্যাসের পোকা আগে মাথায় ছিল। এখন ওসব একেবারেই বাদ। মাসে দুটো বাংলায় ও দুটো ইংরেজিতে কলাম লিখে সে এখন একজন গতায়ু গল্প লেখক। কলাম লেখা ছাড়া জনপ্রিয় একটি টিভি চ্যানেলে সপ্তাহে তার দুটি অনুষ্ঠানের উপস্থাপনাও আছে। বলতে গেলে চাকরির বাইরেও গাধার খাটুনি খাটে সে।

হ্যাঁ, গত পনেরো-ষোলো বছরে কিছুটা খ্যাতির দেখা সে পেয়েছে। তার মাঝারি গড়নের মজবুত শরীর। মাথায় লম্বা চুলের বাবরি, নাকের নিচে বড়সড়ো গোঁফের কান্তিময় চেহারা। বহু লোকই এখন চেনে। শহরের লোকে চেনে। গ্রামের লোকে চেনে।

বুদ্ধিজীবীর অভিধাই তার কপালে জুটেছে আরকি। অথচ তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে মাত্র ২৪ বছর বয়সে একটা মফস্বল শহর থেকে সে যখন ঢাকায় ভাগ্য ফেরানোর আশায় আসে, তখন সে ছিল রোগা-শুঁটকা এক হতাশ যুবক। যার অতীত ছিল খুব কষ্টের, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। এত দিনে বলতেই হবে, সে কিছুটা হলেও জয় পেয়েছে। ভালো চাকরি, মিলির মতো অসাধারণ স্ত্রী, লিখেটিখে নাম—মনে হয় অনিশ্চয়তা থেকে যেন স্বপ্নের মতো জীবনের দেখা মিলেছে। অবশ্য এ জন্য শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না সে। খেটেছে, অনেক রক্ত-ঘাম ঝরিয়েছে শরীর থেকে।

এ সবই তার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। আয়াজ হোসেন—এই নামটা এখন প্রচারমাধ্যমে কিছুটা হলেও সম্মান পায়। সে ছিল গ্রামের ছেলে। মফস্বল শহরে পড়াশোনা। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা পাস দেওয়ায়, এই সময়েই ভালোভাবে চেনাজানা হওয়ার আগেই হাফ আরবান, হাফ রুর‍্যাল ছোটখাটো শ্যামলা স্ট্যাটাসের একটা মেয়েকে হঠাৎ দুম করে সে বিয়ে করে ফেলেছিল। তারপর জীবন টেনে টেনে এগোবার দুর্ভোগ। তারপর বিচ্ছেদ। তারপর হতাশায় ভুগে ভুগে শরীর ছিবড়ে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কত কী আছে!

বিছানায় লাট হয়ে শোয়া আয়াজের চোখে ঘুম আর ছিল না। চেষ্টা করছিল আরাম খেতে খেতে আবেগময় তন্দ্রাটা ফিরিয়ে আনতে। এও ভাবছিল, শনিবারের দিবানিদ্রাটা তেমন না হোক, একলা থাকার, মানুষের জন্য যা খুবই অপরিহার্য, সে রকম একটা অবকাশ তো পাওয়া গেল। এটুকু পাওয়াই বা মন্দ কি!

দুপুর এখন অল্প মরাটে রোদ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে প্রস্থান করেছে। এখন বিকেল। বিকেল কেমন একটা বিষণ্নতা নিয়ে আসে। এ সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। বাথরুমে ঢুকে চোখমুখ ভালো করে ধুয়ে নেয় আয়াজ। স্ত্রীর খুব যত্ন করে তৈরি করা রান্নাঘরে ঢোকে। এক পেয়ালা চা তৈরি করে নিয়ে দক্ষিণের বেশ চওড়া ব্যালকনিতে এসে বসে। আর কিছু না, বিকেলের আস্তে আস্তে ফুরোনোর দৃশ্যটা দেখা, চায়ে চুমুক দিতে দিতে। সন্ধ্যার দিকটায় সে বসবে লিখতে, ডেটা-ম্যাটেরিয়াল মোটামুটি সংগ্রহে আছে। এক হাজার শব্দের কলামটা লিখতে তার ঘণ্টা দুয়ের বেশি লাগবে না।

চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিকেলের দীর্ঘ ছায়া ফেলা দেখছে। এ সময় ইন্টারকম বাজার তীব্র স্বরটা কানে এসে বাজে আয়াজের।

ইন্টারকম ধরে দারোয়ানের কাছে জানা গেল, একটা লোক এসেছে স্যারের কাছে। দেখে গ্রামের লোক বলে মনে হয়। একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। লোকটা বলেছে, মদনপুর বললেই নাকি আয়াজ সাহেব চিনবেন।

প্রথমটায় মদনপুর গ্রামটা মনেই করতে পারল না আয়াজ। কয়েক সেকেন্ড। তার পরই মনে পড়ল, মদনপুর মানে তো সোহানাদের গ্রাম। আটাশ বছর আগে যার সঙ্গে আয়াজ হোসেনের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। আইনগতভাবেই, দুই পক্ষের সমঝোতায়।

একটু বিরক্ত হয়। সেই সঙ্গে আবার খানিকটা উদ্বেগ। বেশ তো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে আয়াজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংসারে। হঠাৎ এর মধ্যে মদনপুর আর সোহানা কেন? মদনপুর থেকে আয়াজের কাছে চিঠি পাঠানোই বা কেন? তার শান্তিপূর্ণ সংসারে সন্দেহ-সংশয় বা অন্য কোনো অনাসৃষ্টির মতলব নেই তো সোহানার?

বিরক্তি ও উদ্বেগ নিয়ে লোকটাকে ওপরে ১০তলায় আসতে বলে দেয় আয়াজ। বিচ্ছেদের পর তার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল সোহানার। এই সংসারে তার দুটি ছেলেমেয়েও আছে বলে সে জানে। এও জানে, দ্বিতীয় সংসারে সোহানার মন টেকেনি। ঘর ও সংসার করা যাকে বলে, তা ঠিক সে করে না। মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। মরিয়মের কাছে সোহানার ভাবান্তর ও রূপান্তরের এসব গল্প শোনে আয়াজ। সোহানা নাকি, কী উদ্দেশ্যে বোঝা যায় না, মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ায়। আগে ঐশ্বর্য বলতে সোহানার ছিল তার একহারা গড়নের শরীরে শ্রী ঝরে পড়া একটা স্বাস্থ্য। এখন নাকি শরীরে স্বাস্থ্য-শ্রী বলতে কিছুই নেই। মরিয়ম বলেছিল, দেখতে নাকি একটা কাজের বুয়ার চেয়ে বিচ্ছিরি হয়ে গেছে সোহানা।

মরিয়ম কালেভদ্রে কখনো-সখনো আয়াজের অফিসে আসে। আয়াজের সেই ফেলে আসা মফস্বল শহরে তার বসবাস। মরিয়মের বাসার পাশের বাড়িতে থাকে সোহানার ছোট বোন

রেহানা। মরিয়মের সঙ্গে ওখানেই কখনো কখনো দেখা হয় সোহানার। তার শরীর হয়ে গেছে রোগা আর নড়বড়ে। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো কালো। শাড়ি-কাপড় অনেক সময়ই থাকে এলোমেলো। মাথার একগাদা রুক্ষ চুলে মাঝেমধ্যে মরিয়মের তাকে পেত্নীর মতো মনে হয়। ভাবাও যায় না, বাংলাদেশে এখনকার সময়ে ছোট পর্দায় ও লিখেটিখে বেশ নামকরা আয়াজ হোসেনের স্ত্রী ছিল একদা। কোনো দিন।

এসব খবর শুনেছে মরিয়মের কাছে। মরিয়ম প্রায় মধ্যবয়সী এক মহিলা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এমএ পাস করেছিল বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দেখতেটেখতে খারাপ নয়। তার খুব ইচ্ছে, টেলিভিশনের সংবাদ পাঠিকা হওয়ার। যেকোনো টিভি চ্যানেলে। হাটখোলার কাছে তার একটা ফ্ল্যাট আছে, দরকার হলে ভাড়াটে উঠিয়ে দিয়ে সে ঢাকায় বসবাস করতে রাজি। আর স্বামী, ছেলেমেয়েরা? ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে ঢাকায় থাকবে আর স্বামী তার ব্যবসা গুটিয়ে ঢাকায় আসতে না চাইলে মফস্বল শহরেই থাকবে, মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসবে। মরিয়ম খুব ভালো মহিলা। তার উচ্চারণ ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ টিভিতে সংবাদ পাঠের বিপক্ষে যায় শুনেও আয়াজের ওপর রাগ করেনি। এরপর কোনো উপলক্ষে ঢাকায় এলে মরিয়ম কখনো কখনো তার অফিসে যায়। একধরনের বন্ধুত্বের বা বলা যাক আলাপচারিতার ক্ষীণ সূত্র গড়ে উঠেছে। আয়াজের সঙ্গে। সোহানার খবরাখবর ওর কাছ থেকেই পায় আয়াজ হোসেন।

বিচ্ছেদের পর সোহানার সঙ্গে কোনো দিন দেখা হয়নি। আয়াজ তো মাঝেমধ্যে তার প্রিয় শহরে ছুটি কাটাতে একা, কখনো পরিবার নিয়ে যায়। সোহানার অনেক আত্মীয় ঢাকায়, কে জানে, সেও হয়তো কখনো ঢাকায় আসে। দৈব বা ঘটনাচক্রে সেই মফস্বল শহর বা ঢাকায় তাদের দেখা হতে পারত। এমন তো কত হয়। কিন্তু বিচ্ছেদের পর কোথাও, কখনো তাদের দেখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, বছর পাঁচেক আগে অফিসের ঠিকানায় সোহানার লেখা একটা চিঠি পেয়েছিল

আয়াজ। চিঠিতে ইনিয়ে-বিনিয়ে বহু দুঃখ, বহু অনুতাপের কথা বলা ছিল। বলা যায়, একটা বড়সড় আবেগকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সোহানা। কথাগুলো এত দিনে আর কিছুই মনে নেই আয়াজের। শুধু মনে আছে, সম্বোধনে সোহানা লিখেছিল, ধ্রুবতারা। বাসায় গিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা চিঠিটার কথা মিলিকে সে জানিয়েছিল। না, মিলি ঠাট্টা-মশকরা করেছিল প্রচুর, তবে রাগ করেনি। স্বামীকে সে এত দিনে ভালোই চেনে।

ডোরবেল বাজে। জবুথবু পোশাকে একটা গ্রামের লোক। চিঠিটা সে খামসুদ্ধ আয়াজকে দেয়। আয়াজ খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ে। লেখা আয়েশা আখতারের। সোহানার মা। চিঠিতে কোনো সম্বোধন ছিল না। বলা ছিল, সোহানা মৃত্যুশয্যায়। গ্রামের বাড়িতেই আছে। একবার দেখতে চায় আয়াজ হোসেনকে। যদি সম্ভব হয়, আয়াজ হোসেন যেন আজকালের মধ্যে সোহানার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে মদনপুরে আসে।

একটু থমকে যায় আয়াজ চিঠিটা পড়ে। সোহানা তার চেয়ে বয়সে দুই-আড়াই বছরের ছোট ছিল। বয়স বায়ান্ন-তেপ্পান্নর বেশি হওয়ার কথা নয়। এই বয়সে মৃত্যুশয্যায়? হয়তো চিকিৎসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর গ্রামের বাড়িতে গেছে।

একটা ধাক্কা খায়। কোনো আবেগ নয়, এক ধরনের ছায়াস্মৃতি তাকে খানিকটা হতবাক ও বিমূঢ় করে দিয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। চিঠি নিয়ে আসা লোকটার কাছ থেকে সোহানাদের বাড়ির একটা সেল নম্বর নিয়ে বলল, যাব কি না, সেটা আজ বা কালের মধ্যে মদনপুরে জানিয়ে দেব। আপনি যান।

আবার সেই বাসার দক্ষিণ ব্যালকনিতে ফিরে আসা। বাতাসের তাণ্ডব আরও একটু বেড়েছে। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। এখন শুধু তার শেষ বিকেলের কনে দেখা আলোটুকু গিলে ফেলা।

আয়াজ খানিকটা বিরক্তি ও উদ্বেগ নিয়ে ম্লানমুখে বসে ছিল। বুঝতে পারছিল, একটা উদ্ভট ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সে। এমন নয় যে বিচ্ছেদ হলেও সোহানার জন্য মনে মনে সে সহানুভূতি পোষণ করত না। কিংবা এখনো করে না। কিন্তু মুশকিল হলো, সে তো এখন সোহানা থেকে বহু দূরে, আলাদা আরেকটা জগতে বাস করে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে সে। একটা সফল দাম্পত্যে যতটুকু আনন্দ-সুখ ধরে, পরিপূর্ণভাবে প্রায় সবই আছে তার মধ্যে। হঠাৎ এসবের মধ্যে সোহানার একটা অনুরোধ এসে পড়া, মৃত্যুশয্যায় সে এখন মদনপুরে। সেখানে আয়েশা আখতার, সোহানার মা, তার সাবেক শাশুড়ির চিঠি পেয়ে যাওয়া উচিত কি উচিত না, আয়াজ ঠিক বুঝতে পারছিল না।

সন্ধ্যার একটু পরই ফিরল মিলিরা। আয়াজকে একটু বিষণ্ন, মনমরা দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে আয়াজ চিঠিটা তুলে দেয় মিলির হাতে। আয়েশা আখতার কে? সে আগে জিজ্ঞেস করে আয়াজকে। চিঠি পড়ে মিলি একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আয়াজ বলে, ভাবছি যাব না। গিয়ে কী হবে?

মিলি বলল, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল যে অন্তত মানবতার খাতিরে হলেও আয়াজের যাওয়া উচিত। মহিলা আয়াজের শত্রু তো নয়। বরং এককালে আয়াজের স্ত্রী ছিল। মহিলা মৃত্যুদশায়। আয়াজকে দেখতে চেয়েছে। আয়াজের অবশ্যই, অবশ্যই যাওয়া উচিত। সম্ভব হলে আজ রাতের ট্রেনেই।

মহিলাটা সারা জীবন তার দুঃখ বয়ে বেড়িয়েছে। কখনো এ নিয়ে কোথাও অভিযোগ করেনি। বিরক্ত করেনি আয়াজকে। এ সবই সত্যি। তবে আবেগ, উচ্ছ্বাস আর কান্নাকাটির মুখোমুখি হতে তার খুব ভয়। একটা খামোখা ঝামেলায় যে সে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে, এ নিয়ে আয়াজের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

রাতে নয়, সকাল আটটার ট্রেনে রওনা দেয় আয়াজ। ছুটে চলার পর ট্রেনের সেই ঝিকমিক শব্দ। ছাড়িয়ে যেতে যেতে দুই পাশে লোকালয়, মাঠ, খেত-জমি, বন-জঙ্গল ও জলাশয়ের পুরোনো দৃশ্য। এই ট্রেন বেশ কয়েকটা স্টেশন এবং একটা জংশন পার হয়ে প্রথমে যাবে তার ফেলে আসা পুরোনো শহরে। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এই ট্রেনই তিনটা স্টেশন পার করে তাকে পৌঁছে দেবে মদনপুর। স্টেশন থেকে সোহানাদের গাছপালা ঘেরা আধাপাকা বাড়িতে হেঁটে যেতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

ট্রেন ছুটে চলেছে। খোলা জানালার পাশঘেঁষে বসা আয়াজকে এ সময় দখল করেছিল একধরনের অন্যমনস্কতা এবং স্মৃতিমন্থনের সুখ-দুঃখ-যাতনা। ট্রেনে যেতে যেতে সে অন্য এক আয়াজ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তার মনে পড়ে, একটা সময় ছিল, সোহানা ও সে একসঙ্গে কিংবা একাই ট্রেনে চেপে মদনপুর যেত। মদনপুরে গেলে তারা শেষ দুপুরে কিংবা বিকেলে অতি অবশ্যই নদীর ধারে যেত, নদী সামনে রেখে বসে থাকত তারা, যতক্ষণ খুশি। সোহানা গান গাইত। গলা ভালো ছিল না তার। সুরজ্ঞানটা যদিও ছিল মোটামুটি। জানত সে মোটে বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে গোটা পাঁচ-সাতেক গান। একটু বললেই এমনকি না বললেও সে গাইতে শুরু করত। একটা গান তো খুবই পছন্দের ছিল তার। বাণিজ্যিক একটা বাংলা ছবির গান। ‘নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে, চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে।’ গীতা দত্তের কিছুটা অপমান করাই আরকি। তবু সোহানা, কেউ পছন্দ করুক না করুক, এই গানটাই বেশির ভাগ সময় গাইত। আয়াজ অবশ্য সোহানার গান শুনত কতটা তা বলা কঠিন। সামনে নদ ব্রহ্মপুত্র। সে তাকিয়ে নদী দেখত। দেখা মানে সেই আদ্যিকালের পুরোনো আকাশ ও মেঘমালা দেখা, কাশবন বাতাসে দুলতে থাকত, কাশবন তো নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দুলতেই থাকে, নতুনত্ব কিছু নেই—না থাকুক, আয়াজ চেয়ে থাকত কাশবনের দিকে। নদ ব্রহ্মপুত্রের শোভা-সৌন্দর্যের ভেতর আরও

ছিল কত হাজার বছরের বহমান জলধারা, আয়নার মতো, যা কখনো কখনো ঝিকমিক করে উঠত। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকত আয়াজ। সোহানার গান না হোক, ব্রহ্মপুত্র নদ তাকে খুব আনন্দ দিত। যতবার দেখত ভালো লাগত। এই শোভা-সৌন্দর্যের আনন্দ যেন ফুরোনোর নয়।

সোহানা ছিল তার প্রিয় এক সহপাঠীর জ্ঞাতি বোন। শহরে বালিকা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত সে। নবম কি দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল সে বিয়ের সময়। গ্রামের মেয়ে, বয়সটা খুব কম ছিল না। সতেরো-আঠারো তো হবেই। আয়াজের চেয়ে তিন কি চার বছরের ছোট ছিল। বন্ধু নুরুল আমিন মাঝেমধ্যে আয়াজকে নিয়ে যেত তার বড় চাচার বাসায়। বড় চাচা বেশ পসার করা মোক্তার ছিলেন। তাঁর বাসায়ই কয়েক দিন আয়াজের সঙ্গে সোহানার দেখা হয়েছে। সোহানার ছিল ছোটখাটো শরীর। একহারা গড়ন। গায়ের রংটা কালোঘেঁষে শ্যামলা। তবে তাজা স্বাস্থ্য নাকি বয়স সোহানার সর্ব অবয়বে একটা আলগা দীপ্তিময় শ্রী দিয়েছিল। আয়াজের তখনো জীবন ও বাস্তবতা মুখস্থ হয়নি। তার সেই বয়সটা ছিল কোথাও কিছুতে খানিকটা মুগ্ধ হওয়ার, কিছু দেখলে দিওয়ানা হওয়ার বয়স। গ্রামের ছেলের শহরে লেখাপড়া শেষ করার পর যা হয়, সোহানাকে দেখে তেমনটাই হয়ে গিয়েছিল আয়াজ। সোহানা ছুটিতে গ্রামে আছে শুনে সে একাই চিনে চিনে একবার চলে গিয়েছিল সোহানাদের বাড়ি। সোহানা হয়তো খুশিই হয়েছিল তাকে দেখে। সে আয়াজকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিল গ্রামের বাঁশঝাড়, দত্তদের দালানবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, হিন্দুপাড়া। আর ব্রহ্মপুত্র নদ দেখাতে তো নিয়েই গিয়েছিল। সেদিনও নদী সামনে রেখে তারা বেশ কিছুক্ষণ বসেছিল। আর সোহানার ‘চুপি চুপি বাঁশি বাজে’ গাওয়া তো ছিলই। একটু বলতেই সোহানা তাকে বেশ কয়েকটা গান শুনিয়ে দিয়েছিল।

এর মাসখানেকের মধ্যে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল সোহানা ও আয়াজের মধ্যে। বিয়েতে দুই পক্ষই ছিল। তবে মেয়ে দেখে বাবার খুব একটা পছন্দ হয়নি বলে মনে হয়েছিল। আশ্চর্য, বিয়ের পর দিন পাঁচেকের মধ্যে আয়াজেরও মনে হয়েছিল, সোহানা ও সে দুজনই দুজনার ভুল মানুষ। বিয়েটা দুটো আলাদা মেজাজ, আলাদা রুচির মানুষের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে এই উপলব্ধি কাউকে বুঝতে দেয়নি আয়াজ। সোহানাকে তো নয়ই। ধরে নিয়েছিল, সোহানা তার ললাট লিখন। করার কিছু নেই, বোরডম যত জমুক, তাকে নিয়ে জীবননদী পাড়ি দিতে হবে।

ট্রেন একটা স্টেশনে থামে। মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়, আবার ছুটতে থাকে। এবার বেশি স্পিড দিয়ে। ট্রেন ছুটছে। আবার আয়াজের স্মৃতির খপ্পরে পড়া। মনে আছে, এ সময় ভাগ্যবশত স্থানীয় একটা কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে গিয়েছিল সে। কলেজের কাছে একটা বাসা নিল দুই রুমের। সোহানার উগ্র মেজাজ, আয়াজকে পাত্তা না দেওয়া, যখন-তখন এর-ওর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া দিন দিন বাড়তেই থাকে। কোনো কোনো সময় বেশ রাত করে বাসায় ফেরে সোহানা। এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে—এ ধরনের প্রশ্নে বরাবরই সোহানার উত্তর ছিল, বাইরে; আবার কোথায়।

সন্দেহের কাঁটা আয়াজের মনে বিঁধেই গিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীকে সন্দেহ করার জন্য নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করত আয়াজ। আবার পাশাপাশি ভাবত, বিছানায় কামিনী নাগিনী হয়ে উঠলে সে তো দানব হয়ে উঠে ঠেকায়। তাহলে এত উপেক্ষা কেন আয়াজকে। দিনগুলো এভাবেই কাটছিল। আয়াজ ধরে নিয়েছিল, এভাবেই জীবনটা কেটে যাবে।

এখন মনে হয় সোহানার সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েছিল যেন সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার জন্যই। এক দুপুরে কলেজ থেকে হঠাৎ বাসায় ফিরে আয়াজ শেষ দৃশ্যটা দেখে ফেলেছিল। বিছানায় সোহানা ও আরেকজন। সোহানারই সম্পর্কীয় ভাই। এর দুই মাসের মধ্যে আইনগত বিচ্ছেদটা

হয়ে গিয়েছিল তাদের। এখন মনে মনে আফসোস করে আয়াজ। তার তখন আর একটু উদারতা, আরেকটু ক্ষমাগুণ যদি থাকত! প্রকাশ না করুক, জীবনভর, গোপনে-সংগোপনে একটা দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ সহানুভূতি ছিলই সোহানার প্রতি। এখন তো জীবনের গতিপথ পাল্টে গেছে। ঢাকা চলে গিয়েছিল সে অন্য একটা চাকরি পেয়ে। এমবিএটা করে ফেলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেলের কোর্সে ক্লাস করে। মিলিকে বিয়ে করেছিল এর কিছুদিন পর। এখন তো একদমই বদলে যাওয়া জীবন তার। এক ছেলে, এক মেয়ে এবং মিলির মতো রসবোধসম্পন্ন এক অসাধারণ স্ত্রী নিয়ে কিস্তি দিয়ে কেনা নিজস্ব ফ্ল্যাটে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে সে। সোহানার প্রতি গোপনে যতই দুঃখ ও সহানুভূতি থাকুক তার, এখনকার জীবনটা হারাতে চায় না সে কোনোমতেই। খ্যাতি, ভালো মাইনের চাকরি এবং একটা সুখের সংসার তার, জীবনে ওয়েলসেট হওয়া বলতে যা বোঝায়। এই জীবনের বিনিময়ে আর কোনো কিছুরই সওদা করতে রাজি নয় আয়াজ।

মফস্বল শহর হয়ে ট্রেনে মদনপুর পৌঁছাতে তার একটা বেজে যায়। গিয়ে জানতে পারে, গতকাল দুপুরের দিকে সোহানা মারা গেছে। অত দূর থেকে ছুটে আসছে বলে বাড়ির কে একজন দয়াপরবশ হয়ে আয়াজকে নিয়ে যায় সোহানার কবরে। আয়াজ চুপচাপ কবরের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, কষ্ট কিছুটা হচ্ছিল তার, অতি অবশ্যই। ভুল হোক, অশান্তিপূর্ণ হোক—যা-ই হোক, সবকিছুর পরও সোহানা তো ছিল তারুণ্য পার হওয়া সদ্য যুবকের প্রথম সঙ্গিনী। এমনকি বলা যায়, প্রথম প্রেম। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সোহানার জন্য আয়াজের কষ্ট খানিকটা হচ্ছিল বৈকি!

তবে করার তো কিছু নেই। বাড়ির সবারই ব্যবহার একটু নিস্পৃহ এবং শীতল হলেও তারা আয়াজকে না খাইয়ে ছাড়ল না। খেয়ে, মিনিট কয়েক এমনিই বসে থেকে বিশ্রাম করে

স্টেশনের দিকে রওনা দেয়। স্টেশনে যেতে কিছুটা হাঁটা পথ। যেতে যেতে চোখে পড়ে নদীটা। হাতে যথেষ্টই সময় আছে। ট্রেন তো পাঁচটায়। নদীটা দেখে যেতে তার খুব ইচ্ছা জাগে। ইতস্তত ছড়ানো গাছপালা আর মাঠ পার হলেই নদী। আয়াজ নদী বা বলা যাক নদ ব্রহ্মপুত্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আগের মতো নেই, ব্রহ্মপুত্র অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। তবে আশপাশের দৃশ্যাবলি, আকাশ, মেঘমালা, চকচক করা জলের আয়না, দূরের কাশবন, নদীর ওপর পাখিদের এপার-ওপার করা—সবই ঠিক আগের মতোই আছে। যেখানটায় সেই বহু আগে, যেন বা শত বছর আগে সোহানা ও সে এসে বসত, সে জায়গাটাও ছিল। 'চুপি চুপি বাঁশি বাজে' গানটা ওই জায়গাটায় বসেই তো গাইত সোহানা।

ঝোপঝাড় থেকে কয়েকটা বনফুল কুড়িয়ে আনে আয়াজ। কিছু ফুল ভাসিয়ে দেয় ব্রহ্মপুত্রে, কিছু ফুল ছড়িয়ে রাখে সোহানা আর সে যেখানে বসত।

আর কী করার আছে। স্টেশনের পথ ধরে হাঁটতে থাকে আয়াজ। নদী ও গানের স্মৃতি বোধহয় মন থেকে কোনো দিন মুছে যাওয়ার নয়। গোপনে গোপনে থেকে যায়।